বাংলাদেশ ২০১৬ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট

সারসংক্ষেপ

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মনোনীত করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি সমুন্নত রাখা হয়েছে। এতে ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সকল ধর্মকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংগঠনসহ বিদেশী তহবিল লাভ করে এমন গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্ট আরো একটি নতুন আইন করেছে। জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন প্রতিরোধের প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার সারা দেশে ইমামদেরকে তাদের খুতবায় কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং বলেছে কোন মসজিদে উষ্কানীমূলক বক্তব্য দেয়া হয় কিনা সে বিষয়ে নজর রাখা হবে। বিগত বছরগুলোতে ব্লগারদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে। যদিও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য অব্যাহতভাবে লেখকদের দোষারোপ করেছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো জানায়, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে সরকার তাদের সঙ্গে ক্রমাগত বৈষম্য করে চলেছে এবং হামলা থেকে সুরক্ষায় যথেষ্ঠ ব্যবস্থা নেয়নি। দেশের স্বাধীনতার পূর্বে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে হিন্দুদের কাছে থেকে বাজেয়াপ্ত করা ভূমিসহ আদালতে বিচারাধীন এক মিলিয়নের বেশি ভূমি প্রত্যর্পন মামলা সরকার নিস্পত্তি করেনি।

সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো বহুসংখ্যক হামলার দায় স্বীকার করেছে। এসব হামলার অনেকগুলো প্রাণঘাতী, অনেকগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। এসব হামলায় হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যসহ অন্তত ২৪ ব্যক্তি নিহত হয়। সন্ত্রাসীগোষ্ঠীগুলো ধর্মান্তরিত, শিয়া এবং নাস্তিক্যবাদে জড়িত বলে সন্দেহ হয় এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করে। পয়লা জুলাই পাঁচ জঙ্গি ঢাকার একটি রেস্তোরায় হামলা চালায়, তাদের আসল লক্ষ্যবস্তু ছিলো অমুসলিম; সেখানে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২৪ জন নিহত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইসলামকে হেয় করার জন্য ব্লগার ও অন্যদের হুমকি প্রদান অব্যাহত রাখে। ৬ এপ্রিল এক ব্লগারকে হত্যার সঙ্গে জড়িত হামলাকারীরা নিজেদেরকে আল-কায়দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দাবি করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হামলা হয়েছে। ইসলামকে হেয় করা হয়েছে বলে মনে করা হয় একজনের এমন একটি ফেসবুক পোস্টের জের ধরে অক্টোবরে দেশের পূর্বাঞ্চলে শত শত মানুষ ৫০টিরও বেশি হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর ও ১৫টি হিন্দু মন্দির ভাংচুর করে। জুনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রবল মাত্রার সহিংসতায় ১২৬ জন নিহত ও ৯,০০০ জন আহত হয়। ঢাকার উপকন্ঠে একটি হামলার ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয় যে শত শত হামলাকারী লাঠিসোটা ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে একদল ক্যাথলিককে পিটিয়েছে এবং তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাংচুর করে, এতে ৬০ জনের মতো আহত হয়।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ও প্রকাশ্য বিবৃতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য প্রতিনিধি ধর্মের নামে সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অধিকার সমুন্নত রাখা এবং বৈচিত্রময় ও সহিষ্ণুতার পরিবেশের উন্নতির জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেন। দূতাবাস প্রকাশ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যদের বিরুদ্ধে হামলার নিন্দা জানায় এবং দায়ী

ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। ডিসেম্বরে দেশটি সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে এই উদ্বেগ তুলে ধরেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং ধর্ম ও সহিংস চরমপন্থার মধ্যে সংযোগ খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। দূতাবাস ধর্মীয় সহিষ্ণুতা জোরদার, হুমকিগ্রস্ত ব্লগারদের সহায়তার উপায় চিহ্নিত করা এবং বার্মা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য অন্যান্য বিদেশি মিশনের সঙ্গে সম্বনয় সাধন করেছে।

সেকশন ১: জনসংখ্যা ধর্মভিত্তিক বিভাজন

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হিসাব মতে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ (জুলাই ২০১৬'র হিসাব)। সর্বশেষ প্রাপ্ত ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ সুন্নি মুসলমান ৯.৫ শতাংশ হিন্দু। জনসংখ্যার বাকি অংশ মূলত খ্রিষ্টান (বেশিরভাগ রোমান ক্যাথলিক) এবং হীনযান-থেরবাদী বৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমদিয়া মুসলিম, নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক রয়েছে। এসব সম্প্রদায়ের অনেকগুলোর অনুসারীর সংখ্যা আনুমানিক কয়েক হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে। অনেক জাতিগত সংখ্যালঘু তাদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করেন এবং প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (সিএইচটি) এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এদের সংখ্যা বেশি। যেমন, ময়মনসিংহের গারোরা মূলত খ্রিষ্টান, গাইবান্ধার সাঁওতালরাও তাই। বেশিরভাগ বৌদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী (অবাঙ্গালী) জনগোষ্ঠীর সদস্য।

বাঙ্গালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সারাদেশে বাস করে। তবে বরিশাল শহর, বরিশাল জেলার গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকা শহরের মনিপুরিপাড়া ও খ্রিষ্টানপাড়া, গাজীপুরের নাগরি এবং খুলনা শহরে এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

নাগরিক নয় এমন সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী হলো রোহিঙ্গা মুসলমানরা। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের হিসাব মতে, দেশের কক্সবাজার জেলায় দুটি সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরের একটিতে বার্মা থেকে আসা ৩২,৯৬৭ জন নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী বাস করে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা'র হিসাব মতে দেশের দক্ষিণপূর্ব কক্সবাজার জেলায় বার্মা থেকে আগত আরো ২০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা রয়েছে। অক্টোবরে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা দেখা দেয়ার পর ৯০,০০০-এর মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে।

সেকশন ২: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান

আইনি কাঠামো

সংবিধান অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।" সংবিধানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্র

কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করা হবে না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। এতে "আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে" যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার দেয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

দণ্ডবিধির আওতায়, "ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলক" মনোভাবপ্রসূত যে কোন বক্তব্য বা কর্ম যা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত বা অপদস্থ করে সেগুলো অর্থদণ্ড বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য। দণ্ডবিধিতে "ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আঘাতে"র সংজ্ঞা না থাকলেও আদালতের ব্যাখ্যায় রাসূল (সা.) প্রতি অবমাননাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যপ্রণালী বিধিতে, কোন সংবাদপত্রে "জনগণের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা ধর্মীয় অনুভুতিকে হেয় করে" এমন কিছু প্রকাশ করা হলে ওই সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই আইন অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় এমন সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা সংবিধান দেয়নি।

কোন একক উপসনালয়ের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই, তবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী যদি বহুসংখ্যক উপাসনালয় নিয়ে কোন সমিতি গঠনের ইচ্ছা পোষন করে এবং তারা প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য বিদেশী সহায়তা গ্রহণ করে তাহলে তাকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে, বিদেশী সহায়তা গ্রহণ না করা হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে।

বিদেশী তহবিল গ্রহণ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর নিয়ন্ত্রণের জন্য অক্টোবরে সংসদ একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে ধর্মীয় সংগঠনসহ এনজিও'গুলোর বিদেশী তহবিল গ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই আইনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ এবং সকল প্রকল্প পর্যবেক্ষণে রাখার আদেশ দেয়া হয়। আইন লঙ্ঘনের জন্য কোন এনজিও'র ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা মহাপরিচালককে দেয়া হয়, এর মধ্যে এনজিও বন্ধ করে দেয়া বা গৃহীত বিদেশী অনুদানের তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপের বিধানও রয়েছে। সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ সরকার) প্রতি "অবামননকর" মন্তব্যের জন্যও এনজিও'গুলোর ওপর দণ্ড আরোপ করা হতে পারে। বিদেশী কর্মী থাকলে তাকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশের বিশেষ শাখা এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স থেকে অবশ্যই নিরাপত্তা অনাপত্তি নিতে হবে।

ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর নিবন্ধনের আবশ্যিক শর্ত ও প্রক্রিয়া একই রকম। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনকালে প্রয়োজনীয় যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে যে নামে নিবন্ধন করা হচ্ছে একই নামে আর কোন সংগঠন না থাকার প্রত্যয়নপত্র; সংগঠনের

বিধিবিধান/সংবিধান; দেশের নিরাপত্তা এজেন্সি থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে নিরাপত্তা অনাপত্তি; নির্বাহী কমিটি নিয়োগ সভার কার্যবিবরণী; নির্বাহী কমিটি ও সকল সাধারণ সদস্যের একটি তালিকা ও মুখ্য কর্মকর্তাদের ছবি; একটি কার্য পরিকল্পনা; সংগঠনের কার্যালয়ের চুক্তি বা লিজের একটি কপি এবং সংগঠনের সম্পত্তির একটি তালিকা; একটি বাজেট; এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সুপারিশপত্র। এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধনের জন্য আবশ্যিক শর্তে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটলেও তা একই রকম বলে আশা করা যায়।

বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ ও দত্তক গ্রহণ-সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের আলাদা বিধান রয়েছে। একই ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে এসব আইন বলবৎ হয়। মিশ্রবিশ্বাসী পরিবার বা যাদের অন্য বিশ্বাস রয়েছে বা কোন বিশ্বাস নেই তাদের জন্য আলাদা দেওয়ানী পারিবারিক আইন রয়েছে। উভয় পক্ষের ধর্ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইন দ্বারা তাদের বিয়ের আচার ও প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। একজন মুসলিম সর্বোচ্চ চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে তবে তাকে আবার বিয়ে করার আগে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের কাছ থেকে অবশ্যই লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। একজন খ্রিষ্টান শুধু একজন নারীকে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু আইন অনুযায়ী পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে, তবে বিয়ে বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক কোন সুযোগ নেই। হিন্দু আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হয় না। বৌদ্ধরা হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত এবং বিয়েবিচ্ছেদ হয়েছে এমন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ আইনগতভাবে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন না। অন্যান্য ধর্মের বিয়ে বিচ্ছেদ হওয়া পুরুষ ও নারী এবং যেকোন ধর্মের বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে অনুমোদিত এবং দেওয়ানী আইনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। আইনগত স্বীকৃতির জন্য মুসলিম বিয়ে সরকারিভাবে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক, দম্পতি বা যে ধর্মগুরু বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন করছেন তিনি তা করবেন, তবে অনেককেই তা করে ন। হিন্দুদের বিয়ে নিবন্ধন করা ঐচ্ছিক, অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ অনুসরণীয় নির্দেশিকা নিজেরাই স্থির করতে পারেন।

মুসলিম পারিবারিক আইনে একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পেয়ে থাকে, বাকি সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে এভাবে বন্টিত হয় যে প্রত্যেক মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের অর্ধেক অংশ পায়। বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। বিয়ে বিচ্ছেদ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ তার সাবেক স্ত্রীকে তিন মাসের ভরণপোষণ দেবে, তবে এই সুরক্ষা সাধারণত নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; সংজ্ঞা অনুযায়ী অনিবন্ধিত বিয়ে কাগজপত্রবিহীন এবং তা প্রমাণ করা কঠিন। তাছাড়া, আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সবসময়, এমনকি নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করে না।

ভূমির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল পারিবারিক বিরোধ ও অন্যান্য দেওয়ানি বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিমসহ সকল নাগরিকের জন্য বিকল্প সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিশের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আইনজীবীদের বাছাই করা যাবে, এর ফলাফল আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধর্মীয় আচার ও চর্চা সম্পর্কিত বিষয়ের সমাধানে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ফতোয়া জারি করতে পারেন, তবে স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা তা পারবেন না। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ফতোয়া ব্যবহার করা যাবে না এবং তা বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে রহিত করতে পারবে না।

সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পাঠ্যক্রমের অংশ। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এই বাধ্যবাধকতা নেই। সরকারের নিয়োগ করা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত পাঠ গ্রহণ করে থাকে, যদিও শিক্ষকরা সবসময় শিক্ষার্থীদের মতো একই বিশ্বাসের অধিকারী হননা।

কারাবিধিতে কয়েদীদের ধর্মীয় উৎসব, ইত্যাদি পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, উৎসবের দিনগুলোতে উন্নতমানের খাবার গ্রহণ বা ধর্মীয় কারণে উপবাসের অনুমতি রয়েছে। আইনে কয়েদীদের নিয়মিত ধর্মগুরুর কাছে যেতে পারা বা নিয়মিত ধর্মীয় আচার পরিপালনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, তবে তাদের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষকে মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তার বিশ্বাসের একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তার কাছে হাজির করতে হয়।

দেশটি দেওয়ানি ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট-এর একটি পক্ষ।

সরকারি আচার ব্যবস্থা

"ইসলামকে হেয় করেছে" এমন কথিত বেশ কয়েকজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারকে হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের সরকার গ্রেফতার করেছে। ২০১৫ সালের মার্চে ওয়াসিকুর রহমানকে হত্যার দায়ে ২০ জুলাই পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৪ আগস্ট তাদের বিচার শুরু হয়। আকরাম হোসেন হাসিব (বড় ভাই নামেও পরিচিত)সহ তিনজন সন্দেহভাজন কারাগারে রয়েছে, বাকি দু'জনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। পুলিশ পাটোয়ারি নামে আহমেদুর রশিদ টুটুল হত্যাকাণ্ডের এক সন্দেহভাজন এবং বাংলাদেশী-আমেরিকান লেখক ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন মইনুল ইসলাম শামীমকে যথাক্রমে ১৫ জুন ২৪ আগস্ট গ্রেফতার করেছে। ১৯ জুন পুলিশের সঙ্গে এক "বন্দুকযুদ্ধে"র সময় অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন শরিফুল ইসলাম শিহাব নিহত হয়, যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে এটি এবং পুলিশের সঙ্গে অন্যান্য বন্দুকযুদ্ধ আসলে বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড। ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য পুলিশ আর্থিক পুরষ্কার ঘোষণা করে, যার ফলে ১৯ মে জঙ্গি গ্রুপ আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্য গ্রেফতার হয়, বিভিন্ন হামলার সঙ্গে এরা জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়।

হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যারা অনেক সময় জাতিগত সংখ্যালঘু হয়, তারা জানায় যে ভূমি মালিকানা নিয়ে বিরোধের কারণে সরকার তাদেরকে অব্যাহতভাবে, প্রয়োজন হলে শক্তিপ্রয়োগ করে, স্থানচ্যুত করেছে, যা তাদেরকে সমঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ধর্মীয় সংঘগুলো জানায়, নতুন সড়ক বা শিল্প উন্নয়ন জোনের কাছাকাছি এমন এলাকা যেখানে সম্প্রতি জমির দাম বেড়ে গেছে, সেখানে অব্যাহতভাবে এ ধরনের বিরোধ সংঘটিত হয়। তারা আরো

বলেছে, স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পত্তি দখলে সহায়তা করে অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এমন সম্পত্তি দখলবাজদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করে। কিছু মানবাধিকার সংগঠন এসব বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিকূল সরকারি নীতির পরিবর্তে বিচারিক ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির অভাবকে দায়ি করে।

৬ নভেম্বর গাইবান্ধা পুলিশ সাঁওতাল উপজাতির লোকজনের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে, এদের বেশিরভাগ খ্রিষ্টান। এরা চিনিকলের আখ উৎপাদনের জন্য ১৯৬২ সালে যেসব ভূমি অধিগ্রহণ করে সেগুলো অধিকারের চেষ্টা করছিলো। পুলিশ ও মিলের সাবেক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সাঁওতালরা তীর-ধনুক ব্যবহার করে। সংঘর্ষে তিন সাঁওতাল নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। মে মাসে সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, উত্তরপূর্বাঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন ৭০০ খাসিয়া আদিবাসী জনগণকে তাদের পৈত্রিক ভূমি থেকে উচ্ছেদের জন্য নোটিশ জারি করে। এরা মূলত ক্যাথলিক। এদের বিরুদ্ধে ৬০ হেক্টর (১৫০ একর) সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে পান চাষের অভিযোগ আনা হয়। জেলা প্রশাসন নাহার টি এস্টেটের হয়ে কাজ করেছে বলে উপজাতীয় অধিকার কর্মীরা জানায়। এই কোম্পানি ২০০৭ সাল থেকে নিজের সম্পত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। উপজাতীয় অধিকার কর্মীরা বছরের শেষ পর্যন্ত ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে।

আগস্টে সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, আক্তার হোসেন নামে রংপুরের এক স্থানীয় পরিষদ সদস্য এক স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাকে "বিয়ে-বহির্ভুত সম্পর্কে" জড়িত থাকার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেয়। ওই মহিলার স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে পুরুষটি তার ঘরে ঢুকে এই ঘটনা ঘটায়। ৪০০ গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ওই পরিষদ সদস্য মহিলার কোন বক্তব্য না শুনে ঠিক করে দেয় যে তাকে তার স্বামী ১০১টি বেত্রাঘাত করবে। আর, পরিষদ সদস্য ওই পুরুষটিকে ২০টি বেত্রাঘাত করবে। একই মাসে স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জানায়, বিচারবহির্ভুভাবে গ্রামবাসীদের শাস্তি দিতে ফতোয়া জারি করা থেকে গ্রাম্য নেতাদের বিরত রাখতে স্থানীয় পরিষদগুলোকে নির্দেশ দিতে জেলা কমিশনারদের বলা হয়েছে।

সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজন স্থলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে। সরকার হিন্দুদের উৎসব দুর্গাপূজা, ক্রিসমাস, ইস্টার, বৌদ্ধদের উৎসব বৌদ্ধপূর্ণিমা এবং বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখেও অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

বেশিরভাগ মসজিদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও সরকার সারাদেশে ইমামদের দেয়া খুতবার বিষয়বস্তুর কিছু দিকের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। জুলাইয়ে ব্যাপক প্রচারিত হলি আর্টিজান বেকারি ও শোলাকিয়া ঈদগাহে সন্ত্রাসী হামলার পর সরকারি তহবিলে পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জঙ্গিবাদের নিন্দা জানিয়ে একটি খুতবা প্রকাশ করা হয়, এবং শুক্রবারের জুমা নামাজে এই খুতবা প্রদানের জন্য ইমামদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়। সরকারি

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইমামদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কোরআন থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো তুলে ধরতে ইমামদের পরামর্শ দেয়। সরকারপন্থী একজন বিশিষ্ট আলেম জঙ্গিবাদের নিন্দাসূচক একটি ধর্মীয় অনুশাসন প্রকাশ করেন, যাতে ১০০,০০০-এর বেশি ইমাম স্বাক্ষর করেন বলে জানা যায়। তবে সরকারপন্থী নয় এমন অনেক ইমাম তা প্রত্যাখ্যান করেন।

জঙ্গিবাদ-বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে, জুলাইয়ে সরকার ঘোষণা দেয় যে কোথাও উষ্কানিমূলক বক্তব্য দেয়া হচ্ছে কিনা তা জানতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ১,৪০০ নিয়মিত স্টাফ, সরকারি কর্মচারি, আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, এবং সাধারণ জনগণের সহায়তায় দেশের ২৫০,০০০-এর বেশি মসজিদে খুতবার ওপর নজর রাখা হবে। ঢাকায় রাষ্ট্র পরিচালিত জাতীয় মসজিদের ইমাম নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে এবং এই মসজিদের খুতবার বিষয়বস্তুর ওপর সরকারের প্রভাব প্রবল। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন সকল মসজিদে ইমামগণ সরকারি নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন খুতবা সাধারণত পরিহার করেন।

সরকার ভারতের টেলিভিশন-ভিত্তিক ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েক'র পিস টিভি বাংলা সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে। এই চ্যানেল চরমপন্থী মতবাদের বিস্তার ঘটায় বলে উল্লেখ করা হয় এবং তার প্রচারিত শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'পিস স্কুল' বন্ধ করে দেয়। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো জানায়, পিস টিভি বাংলা বন্ধ করতে গিয়ে সরকার বাড়াবাড়ি করেছে। সরকার ওই চ্যানেলের উপযুক্ত করে স্থানীয়ভাবে তৈরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি দিতে পারতো, এমনকি চাইলে জাকির নায়েকের অনুষ্ঠানও সেন্সর করা যেতো।

৪ মে, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু একটি মিডিয়া মনিটরিং সেল তৈরির ঘোষণা দেন, তার ভাষায় যা হিন্দু, মুসলিম ও অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সম্পর্কে নেতিবাচক লেখা প্রচার করে এমন মিডিয়া ও ব্লগের ওপর নজর রাখবে। এগুলো দেশে আস্তিক-নাস্তিক বিভক্তি সৃষ্টি করেছে বলে তিনি জানান। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা জানান, মে মাসে সরকারের বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জনপ্রিয় অনলাইন ব্লগ প্ল্যাটফর্ম *সামহয়্যারইনব্লগ* বন্ধ করে দেয়। অতীতে এই সাইটটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগাররা ব্যবহার করতো।

ইসলামকে হেয় করার অভিযোগে ব্লগারদের ওপর একাধিক জঙ্গি হামলার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ব্লগারদেরকে "তাদের লেখা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে...জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে যেন কোন লেখা কাউকে আঘাত না করে" যা "কোন ধর্ম, কোন মানুষের বিশ্বাস, এবং ধর্মীয় নেতাদের" আহত করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন "কেউ যদি আমাদের নবী বা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লিখে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না।"

এছাড়া সরকার স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়া হিন্দুদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা ভূমি সংক্রান্ত দশ লাখের বেশি মামলার একটিও নিষ্পত্তি করেনি, তখন এসব ভূমি শত্রুসম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সরকারের অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আগের মালিকদের আপিল করার অনুমতি

দিয়ে ২০১১ সালে একটি আইন পাস করা হয়, এরপর থেকে মামলাগুলো ঝুলে আছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা জানায়, ধর্মীয় শিক্ষা ক্লাসে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও সংখ্যালঘু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে স্কুল কর্মকর্তারা সাধারণত ওই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়সূচির বাইরে স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক বা অন্যদের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা ক্লাস আয়োজনের অনুমতি দেন। কখনো কখনো ওইসব শিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), আইন-ও-সালিশ কেন্দ্র (এএসকে), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ও বাঁচতে শেখা'র মতো নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো হিন্দুদের বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতামূলক আইন বজায় রাখার জন্য সরকারের সমালোচনা করেছে। এ বছর রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এবং এমজেএফ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে ২৬.৭ শতাংশ হিন্দু পুরুষ এবং ২৯.২ শতাংশ হিন্দু নারী বিয়ে বিচ্ছেদ গ্রহণে ইচ্ছুক হলেও বিদ্যমান আইনের কারণে তারা তা গ্রহণ করতে পারছে না।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে সরকার ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দানসহ ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকারি বাজেটের একটি লাইন আইটেম থেকে ধর্মমন্ত্রণালয় পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ৩.৫ বিলিয়ন টাকা (৪৪.৩ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ দিয়েছে। সরকার ২,১৩৪টি মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে অনুদান সহায়তা হিসেবে ১৮৫.৪৯ মিলিয়ন টাকা (২.৩ মিলিয়ন ডলার) দেয়। ২০১৬ সালে সরকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর কল্যাণে কাজ করে এমন তিনটি ট্রাস্ট: হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট (এর সম্পদের পরিমাণ ২০৫ মিলিয়ন টাকা, ২.৬ মিলিয়ন ডলার), খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (সম্পদ ৫০ মিলিয়ন টাকা, ৬৩৩,০০০ ডলার), এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট (সম্পদ ৭০ মিলিয়ন টাকা, ৮৮৬,০০০ ডলার) - এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাজ করে। সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ট্রাস্টিগণ এই তিনটি ট্রাস্ট পরিচালনা করেন এবং এগুলোর সম্পদের আয় থেকে মন্দির, গির্জা ও মঠের উন্নয়ন ও মেরামত কাজের জন্য তহবিল যোগান দেন।

এই বছরে হিন্দু ও বৌদ্ধ ট্রাস্ট সরকারের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সহায়তা পেয়েছে। এছাড়া, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট তার কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছে। এর বাইরে পার্লামেন্টের মাধ্যমে মন্দির উন্নয়ন বিষয়ক রাজস্ব বাজেট থেকে ১,১৭৩টি হিন্দু প্রতিষ্ঠান ৪১.৯৫ মিলিয়ন টাকা (৫৩১,০০০ ডলার), এবং দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ১৫ মিলিয়ন টাকা (১৯০,০০০ ডলার) অনুদান পায়। ১,০৪৬টি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মন্দির উন্নয়ন ও মেরামতের জন্য ৪.১৩ মিলিয়ন টাকা (৫২,৩০০ ডলার) এবং ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের জন্য বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ৫ মিলিয়ন টাকা (৬৩,৩০০ ডলার) লাভ করে।

পনেরটি খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান গির্জা উন্নয়ন ও মেরামতের জন্য সরকারের কাছ থেকে ৩.১৫ মিলিয়ন টাকা (৩৯,৯০০ ডলার) পায়। সরকারের কাছ থেকে বাড়তি বিশেষ কোন অনুদান পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আবেদন করেনি। সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতারা বার বার বলেছেন যে

সরকার তাদের ট্রাস্টগুলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো একই ভিত্তিতে তহবিল দেয়নি। তারা জানায়, রাষ্ট্রীয় বাজেটের বার্ষিক বরাদ্দ থেকে ফাউন্ডেশন তহবিল লাভ করে, অন্যদিকে ট্রাস্টগুলো তাদের মূলধনী তহবিলে সরকারের দেয়া চাঁদার আয়ের ওপর নির্ভর করে।

মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব স্মরণে প্রেসিডেন্ট সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রেখেছেন।

বিদেশী শক্তি ও রাষ্ট্রবহির্ভুত অ্যাক্টর কর্তৃক নির্যাতন

বিভিন্ন চরমপন্থী সংগঠন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এসব সংগঠনের অনেকে নিজেদেরকে আইএসআইএস বা আল-কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবি করে। বেশিরভাগ হামলায় ঘাতকরা চাপাতি ব্যবহার করে। বেশিরভাগ হামলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ছিলো লক্ষ্যবস্তু। ২০১৫ সালে যেখানে তিনটি হামলার ঘটনায় একজনের মৃত্যু ঘটে, সেই তুলনায় ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে আলাদা ১০টি হামলায় দশজন হিন্দু নিহত হয়, এদের মধ্যে ছিলেন পুরোহিত, মন্দিরের কর্মী, শিক্ষক ও ব্যবসায়ী। এসব হামলার সাতটিতে আইএসআইএস দায় স্বীকার করেছে।

১ জুলাই, ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে পাঁচ জঙ্গি ২৪ জনকে হত্যা করে, যাদের বেশিরভাগ অমুসলিম। জানা যায়, ঘাতকরা অমুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করে এবং কয়েকজন জিম্মিকে কোরআনের আয়াত পাঠ করতে বলে। হামলাকারীরা কয়েকজন জিম্মির ওপর নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বলে মিডিয়া জানায়। উদ্ধার অভিযানকালে সেনাবাহিনী পাঁচ হামলাকারীকে হত্যা করে। ২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ দফায় দফায় অভিযান চালায় এবং আগস্টে এই হামলার একজন সন্দেহভাজন সংগঠক তামিম আহমেদ চৌধুরীকে হত্যা ও অন্য সন্দেহভাজন সহযোগীদের আটক বা হত্যা করে। আইএসআইএস এই হামলার দায় দাবি করলেও সরকার বলেছে অপরাধীরা জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশের একটি দলছুট অংশ, যাদেরকে নব্য-জেএমবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

মুসলমানদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়েছে। ৭ জুলাই, আইএসআইএস শোলাকিয়ায় ঈদ জামাতের ময়দানের কাছে বোমা হামলা ও বন্দুক যুদ্ধের দায় স্বীকার করে, এতে চারজন নিহত ও সাতজন আহত হয়।

ইসলাম থেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত দুই ব্যক্তিকে হত্যার দায় স্বীকার করে আইএসআইএস। ৭ জানুয়ারি প্রথম ঘটনায়, ঝিনাইদহে ছমির উদ্দিন মণ্ডল নামে ৮৫ বছর বয়সী এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে তার কর্মস্থলে বুকে ছুরিকাঘাত করা অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ২২ মার্চ, কুড়িগ্রামে হোসেন আলী সরকার নামে আরেকজন খৃস্টধর্ম গ্রহণকারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

৩০ জুন, বান্দরবান এলাকায় বৌদ্ধ কৃষক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মং সোয়ে লাং মার্মাকে চাপাতি দিয়ে হত্যার দায়ও আইএসআইএস স্বীকার করে।

৫ জুন, বড়ইগ্রামে সুনীল গোমেজ নামে এক খ্রিষ্টান মুদি দোকনিকে হত্যার দায় স্বীকার করে আইএসআইএস।

২০ মে এক হামলার দায় আইএসআইএস স্বীকার করে। এ দিন সানাউর রহমান নামে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও বাউলভক্ত (লোকসঙ্গীতের একটি অদৃশ্য শৈলী, সুফিবাদের অনুসারীরা প্রায়ই এই গান গেয়ে থাকেন) ও তার বন্ধু মটরসাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় আরেকটি মটরসাইকেলে চড়ে আসা তিন ব্যক্তি তাদের ওপর হামলা চালায়। রহমান নিহত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জামান গুরুতর আহত হন। খুলনা জেলার কুষ্টিয়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

১৪ মে, বান্দরবান জেলায় প্রবীণ বৌদ্ধভিক্ষু মং শু ইউ চাক নিজের মঠে খুন হন, এই হত্যাকাণ্ডের কৃতিত্ব আইএসআইএস দাবি করে।

২৩ এপ্রিল, কর্মস্থলে যাওয়ার পথে খুন হন প্রফেসর রেজাউল করিম সিদ্দিকী। আইএসআইএস এই হামলার দায় স্বীকার করে এবং জানায় "অন্যদের নাস্তিকতার প্রতি আহ্বান" জানানোর দায়ে সিদ্দিকীকে হত্যা করা হয়েছে। সিদ্দিকী মুসলমান ছিলেন বলে জানা যায় এবং ছিলেন একটি সঙ্গীতের স্কুল প্রতিষ্ঠাতা ও একটি সাহিত্য ম্যাগাজিনের সম্পাদক – এসব কর্মকাণ্ডকে আইএসআইএস "নাস্তিকতা"র সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে।

৬ এপ্রিল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র নাজিমুদ্দিন সামাদকে চাপাতি দিয়ে কুঁপিয়ে হত্যা করা হয়, হামলাকারীরা নিজেদেরকে একিউআইএস-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবি করে। তারা সামাদের বিরুদ্ধে "আল্লাহ, নবী মোহাম্মদ, ও ইসলামকে হেয় করার" অভিযোগ আনে। ফেব্রুয়ারিতে একটি অজ্ঞাত গ্রুপ টার্গেটকৃত ব্লগারদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। ৩ এপ্রিল, অতীতে ব্লাগারদের হত্যকাণ্ডের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে একিউআইএস অনলাইনে একটি ভিডিও প্রকাশ করে এবং যারা "নবী মোহাম্মদকে হেয় করে এবং কুৎসা রটায় তাদের সবাইকে হত্যার" জন্য আহ্বান জানায়।

শিয়া ধর্মপ্রচারক হাদিথ আব্দুর রাজ্জাকে হত্যার দায়ও আইএসআইএস স্বীকার করে, ১৪ মার্চ ঝিনাইদহে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

২৩ আগস্ট নরসিংদী জেলায় চিত্তরঞ্জন আর্জিয়া নামে এক হিন্দু মুদি দোকানির ওপর চাপাতি দিয়ে হামলার দায় স্বীকার করে আইএসআইএস'র সংবাদ সংস্থা আমাক। আর্জিয়া হামলা থেকে বেঁচে যান। তিনি তার দোকানের পাশে অবস্থিত একটি কালি মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক।

সেকশন ৩. ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধার পরিস্থিতি

সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ফলে হত্যা, নির্যাতন এবং সম্পত্তি ধ্বংসের মত ঘটনা অব্যহত আছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভূমি মালিকানা

সংক্রান্ত বিরোধে সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলেছেন, চাকরি ও আবাসন ক্ষেত্রে তারা অব্যাহতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। জাতীয়তা বেশিরভাগ সময়ই নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় ঠিক কতগুলো ঘটনা কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে ঘটেছে তা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন ছিল।

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও শালিস কেন্দ্রের তথ্য মোতাবেক হিন্দু জনগোষ্ঠী কিংবা তাদের সম্পত্তিকে লক্ষ্য করে আক্রমণে সাতজন নিহত এবং ৬৭ জন আহত হয়েছে; তুলনামূলকভাবে ২০১৫ সালে কোন হত্যার ঘটনা না ঘটলেও ৬০জন আহত হয়েছিল। এইসব আক্রমণে ১৯৭টি মুর্তি, আশ্রম বা মন্দির ধ্বংশ করা হয়েছে; এমন ঘটনার সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ২১৩টি। একই সময়ে ১৯২টি বসতবাড়ী এবং ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ করা হয়েছে, যেখানে ২০১৫ সালে বাড়ী ধ্বংশের সংখ্যা ছিল ১০৪টি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬টি। অনেক ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্য জানা যায়নি।

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে পঞ্চগড় জেলায় হিন্দু পুরোহিত যোগেশ্বর দাস অধিকারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। আততায়ীরা হত্যার পর মোটর সাইকেলে চড়ে পালিয়ে যাবার সময় দেশী প্রযুক্তিতে তৈরী বোমা বিষ্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায় দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীও আহত হন।

রাজশাহীর তানোরে মে মাসের ৬ তারিখে সুফী পীর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। কেউ এই হত্যার দায় স্বীকার না করলেও পুলিশ দাবী করেছে এই ঘটনা পূর্ববর্তী জঙ্গী আক্রমণেরই ধারবাহিকতা। জঙ্গীরা সুফী মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে শত্রু হিসেবে গণ্য করে।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে জানুয়ারির ৯ তারিখে নওগাঁ জেলায় কর্তৃপক্ষ একজন আদিবাসী ক্যাথলিক খ্রিস্টানের বিকৃত ও আংশিক পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ২ জুলাই তারিখে ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলায় তিনজন মুখোশধারী আততায়ী চাপতি নিয়ে হিন্দু পুরোহিত পলাশ চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ করে। কিন্তু তিনি লোহার রড দিয়ে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ২ জুলাই সাতক্ষীরা জেলায় অন্য এক ঘটনায় ভবসিন্ধু বার নামে অপর এক হিন্দু পুরোহিতকে আততায়ীরা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মিডিয়ায় প্রকাশিত আরেকটি 'হত্যাচেষ্টা'র ঘটনায় বান্দরবান জেলায় একজন মুখোশধারী আততায়ী চাকু হাতে বাবুল চক্রবর্তী নামে একজন হিন্দু পুরোহিতের ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করে। পুরোহিতের পুত্রবধু এই ঘটনা দেখতে পেলে ঐ আততায়ী পালিয়ে যায়।

পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী মে মাসে পশ্চিম চুয়াডাঙ্গায় মুসলমান থেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেয়া একটি পরিবারের বাড়ীতে দুষ্কৃতিকারীরা ছয় থেকে সাতটি হাতবোমা নিক্ষেপ করলে একজন গুরুতর আহত হন।

আগস্টের ৪ তারিখ সন্ধ্যায় বান্দরবান জেলার দাবনখালী মারমা পাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের দরজা ভেঙে চার-পাঁচ জন লোক ধারালো চাকু নিয়ে তাইন দিমা ভিক্ষুর উপর হামলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাউন দিমা ভিক্ষু মাইকের মাধ্যমে আশে পাশের মানুষকে ঘটনা জানিয়ে সাহায্য চাইলে আততায়ীরা পালিয়ে যায়।

সুফী ধর্মীয় চর্চাকারী বাউল সাধক সম্প্রদায়ের উপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে। চুয়াডাঙ্গায় বসবাসকারী একদল বাউলের উপর ১৭ জুলাই হামলা করা হয়। জুলাই মাসের ৩০ তারিখে চুয়াডাঙ্গায় তিনজন বাউলের উপর ২২ থেকে ২৫ জন ব্যক্তি হামলা করে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। আক্রমনকারীরা বাউলদের প্রায় দেড়ঘন্টা আটক করে রাখে এবং তাদের আখড়া (ধর্মীয় স্থাপনা) এবং কাব্যগ্রন্থ পুড়িয়ে দেয়। তারা বাউলদের চুল কেটে দেয় এবং তারা যদি ভবিষ্যতে এই এলাকায় বাউল ধর্মের চর্চা অব্যহত রাখে তাহলে তাদের হত্যা করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবার হুমকি প্রদান করে।

হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক সহিংস্রতা হয়েছে। জানুয়ারির ১১ তারিখে, স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার প্রধান অভিযোগ করেন যে একজন হিন্দু ব্যক্তি কোরআন পুড়িয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় হিন্দু মন্দির ও আশ্রম ঘেরাও করে। তারা মন্দির এবং আশ্রমের কোন ক্ষয়-ক্ষতি না করলেও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা কোরআন পোড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত হিন্দু ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে লেখালেখির দায়ে অভিযুক্ত করে ব্লগারদের হত্যা এবং হত্যার হুমকি প্রদান অব্যাহত ছিল। মে মাসে সালাউদ্দিনের ঘোড়া নামের একটি ওয়েব পেজ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার দায়ে অভিযুক্ত পাঁচজন প্রবাসী ব্লগারের নাম উল্লেখ করে তাদের শিরোচ্ছেদ করার জন্য আহবান জানানো হয়। এমন হুমকীর কারণে অনেক ব্লগার এবং লেখক তাদের লেখালেখি কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ নেপাল ও শ্রীলংকাসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন।

জুন মাসে স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনের সময় সহিংসতার পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ঢাকার উপকন্ঠে একটি নির্বাচনে তিনজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী প্রার্থী হবার কারণে শতাধিক লোক বাঁশ ও লাঠি নিয়ে স্থানীয় ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দিয়ে ঐ ক্যাথলিক খ্রিস্টান প্রার্থীদের ভোটদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় ১০জন মহিলাসহ মোট ৬০জন ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং ৪জনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তরা বছরের শেষ নাগাদ জামিনে মুক্তি পায়।

বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর গ্রামে একজন হিন্দু ব্যক্তির ফেসবুকে মক্কা নগরীর কাবা ঘরের উপর একটি হিন্দু দেবতার মুর্তির ছবি প্রচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩০ অক্টোবর ঐ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ১০০ থেকে ১৫০জন গ্রামবাসী আক্রমণ করে। দিওয়ালীর ছুটির মধ্যে এই ঘটনায় তারা ৫২টি হিন্দু বাড়ী এবং ১৫টি মন্দির ভাংচুর করে,

শতাধিক মানুষকে আহত করে এবং আটটি দোকান পুড়িয়ে দেয়। এই সহিংস্রতার পর স্থানীয় সরকারপন্থী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে ঐ ফেসবুক পোস্টের বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ১০৪ জনকে গ্রেফতার করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনার উপর একটি সত্যানুসন্ধান তদন্ত করার পর উল্লেখ করে যে, স্থানীয় হিন্দুদের বিতাড়িত করে তাদের জমি-জমা দখল করার জন্যই এই হামলা চালানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী, সরকারি দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় দুইটি উপদলীয় কোন্দলের কারণেই হিন্দুদের বাড়ী-ঘর এবং মন্দিরে হামলা করা হয়। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরা এই সহিংসতার প্রতিবাদ জানানোর সময় হিন্দুদের উপর এই আক্রমণের নির্দেশদাতা হিসেবে স্থানীয় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সায়েদুল হককে দায়ী করেন, তারা আরো বলেন যে, এই সংসদ সদস্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের অপমান করে থাকেন। জানুয়ারী, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে আরো কয়েকটি ঘটনায় গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা এবং বরিশাল জেলায় বেশ কিছু হিন্দু মূর্তি ভাংচুর এবং মন্দির লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সন্দেহভাজনদের কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করে এবং তাদের বিচার বছরের শেষ নাগাদ চলছিলো। নভেম্বরের ১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ভিডিও কনফারেন্সে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার নির্দেশ প্রদান করেন।

বেসরকারি সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু মুসলমান বাঙালি অভিবাসীদের সাথে সেখানকার ভূমিপুত্র বৌদ্ধ, হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরাজমান উত্তেজনা বিষয়ে প্রতিবেদন অব্যাহত রেখেছে। ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা আরো অংশগ্রহণমূলকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য সরকার পার্বত্য শান্তিচুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান ভূমি আইন সংস্কার করার জন্য কাজ করছে। একটি বেসরকারি সংস্থা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, বান্দরবান এলাকায় মুসলমান অধিবাসীরা আদিবাসী হিন্দু ও খ্রিস্টানের শিশু সন্তানদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সেকশন ৪. যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি

যুক্তরাষ্টের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন, সেই সাথে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথেও বৈঠক করে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। তারা সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগ সফল করার জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইতিবাচক প্রভাব আলোচনার পাশাপাশি ধর্ম এবং উগ্র মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্যেকার পার্থক্যও আলোচনা করেছেন। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের উপর উগ্রবাদী সন্ত্রাসী হামলা থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়টিও নজরে এনেছেন।

ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তিনি সরকারি আলোচকদের সাথে বৈঠকে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণকারীদের বিচারের আওতায় আনার উপর

গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকার এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বিশেষ দূত স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার এবং মত প্রকাশের মধ্যেকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন। সেই সাথে তিনি এটিও বলেন যে, আক্রমনাত্মক বক্তব্যকে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে বাধা দেয়া একটি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ।

ক্রমবর্ধমান হারে বার্মা থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান এবং তাদের সুরক্ষার বিষয় নিয়ে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত দেশের দক্ষিনাঞ্চলে অবস্থিত শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে খোঁজ-খবর করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ কক্সবাজারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাক্ষাত করে ২০১২ সালে তাদের উপর ঘটে যাওয়া হামলা পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেন। কমিউনিটি পুলিশি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের উৎসাহিত করেন।

দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারি ও বেসরকারি ফোরামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। মার্চ মাসে হিন্দুদের জাতীয় ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনকালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি সকল ধর্মাবলম্বীদের সুরক্ষায় আইনের সম প্রয়োগের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ব্যক্ত করেন। দূতাবাসের উদ্যোগে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, অক্টোবর এবং ডিসেম্বর মাসে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে এবং সম্মিলিতভাবে গোল-টেবিল বৈঠক করেন এবং তাদেরকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেন। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী নেতা এবং তাদের প্রতিনিধি দলের সাথেও বৈঠক করেন এবং চলমান সহিংস চরমপন্থা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যেকার ভারসাম্য এবং রাজনীতি ও ধর্মের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে অনেক ধর্মীয় সংগঠন এবং প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাদী ফাউন্ডেশন (একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন), বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, হিন্দু মহাজোট, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কনসাসনেস- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়াস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, এপোস্টলিক নানসিও, এশিয়ান কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন এন্ড পিস সেন্ট্রাল কমিটি, আহমাদিয়া মুসলিম জামাত (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ পুজা উদজাপন কমিটি, হটলাইন হিউম্যান রাইটস বাংলাদেশ এবং হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজ।

হুমকির মুখে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের সহায়তা প্রদানের জন্য ১১টি বিদেশী মিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত বৈঠক করেছেন। এর মধ্যে কয়েকজন ব্লগার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় পাবার আগ্রহ প্রকাশের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দূতাবাসের সাহায্য নিয়ে অনেক ব্লগারই তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত যখন বাংলাদেশ সফর করছিলেন, তখন দূতাবাসের আয়োজনে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনটাক্ট গ্রুপের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাংলাদেশে

অবস্থিত মিশন প্রধানদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণকারীদের দায়মুক্তির বিষয়টিসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।